# প্রথম অধ্যায়

# বাংলা সাময়িকপত্রের ধারায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

উনিশ শতকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতিতে যে নতুনতর চিন্তা-চেতনার সূত্রপাত হয়েছিল, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা মুখ্যত বাংলা গদ্যকে বাহন করে প্রসার লাভ করে। আর এই গদ্যভাষার প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সাময়িক পত্রিকা। সাময়িক পত্রিকার মধ্য দিয়ে কোনো একটি দেশের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সামাজিক সংস্কার, ধর্মীয় সংস্কার, সাংস্কৃতিক জীবন এবং শিক্ষা সংক্রান্ত নানা প্রকার প্রচারের মধ্য দিয়ে সাময়িক পত্রিকা বঙ্গজ জনের চিত্তে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন দেশের সভ্যতার অগ্রগতি এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার সংক্রান্ত নিত্যনতুন সংবাদ প্রকাশ, রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়ের নানা তথ্য ও আলোচনা এবং বাইরের দেশ সম্পর্কিত নানা সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে সাময়িক পত্রিকা বঙ্গবাসীদের মর্মমূলে প্রবল গতিবেগ সঞ্চার করেছিল। নতুন নতুন ভাবনা, চিন্তার ও অভিজ্ঞতার দুয়ার খুলে দিয়েছিল এই সব সাময়িক পত্রিকা। সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের দ্বারাই শহুরে বাঙালিকে দ্রুত আলোড়িত করা সম্ভব হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। ফলে জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে শুরু হয় নবজাগরণ। আর এই নবজাগরণের অন্যতম দিক হচ্ছে সাময়িকপত্র প্রকাশ। গ্রন্থ প্রকাশ ও সাময়িকপত্র প্রকাশে ছাপাখানার ভূমিকা অপরিসীম। তবে একক প্রচেষ্টায় গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হলেও সাময়িক পত্রিকা একক প্রচেষ্টায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই পত্রিকা প্রকাশ একটি প্রতিষ্ঠানের মতো হয়ে উঠল। কারণ সাময়িক পত্রিকার কলেবর পুষ্ট করবার জন্য একাধিক লেখকের একাধিক বিষয় কেন্দ্রিক রচনা প্রকাশের প্রয়োজন হয়। সুতরাং সমবেত প্রচেষ্টায় সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় নিত্য নতুন সংবাদ প্রকাশ এবং বিভিন্ন বিষয়ে গদ্য রচনার প্রচার ও প্রসার খুব সহজেই মানুষের মনকে আকৃষ্ট করল। স্কুল বুক সোসাইটির প্রচেষ্টায় স্কুল পাঠ্য বাংলা বই বাংলা গদ্যরীতিকে সুনির্দিষ্ট আকার দান করেছিল সত্য কিন্তু স্কুল

কলেজের সীমাবদ্ধ পরিসর থেকে সাময়িক পত্রিকাই বাংলা গদ্যকে বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিল।

সাহিত্যচর্চাই সাময়িকপত্রের প্রধান উপজীব্য বিষয়। কিন্তু সাহিত্য ছাড়াও সামাজিক, রাষ্ট্রিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ও সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। আবার কখনো কখনো এই সমস্ত বিষয়ই সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠত। তাই সাময়িক পত্রিকার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কারণ সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনার মাধ্যম হিসেবে সাময়িকপত্রের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানের লেখকেরাও সাময়িকপত্রে তাঁদের রচনা প্রকাশ পাবে এই তাগিদের বশে নিজেদেরকে পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন। ফলে বাংলা সাহিত্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা বাংলা গদ্যকে সংস্কৃত ভাষার আনুগত্য থেকে মুক্ত করে স্ত্রীসমাজ ও বালকদের উপযোগী করে প্রকাশ করাই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। সাহিত্য জগতে ভাবের, চিন্তার এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সাময়িক পত্রিকাগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আর বাংলা গদ্যরীতির বিবর্তনের ইতিহাসেও সাময়িক পত্রিকার অবদান রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সুকুমার সেন-এর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে -- ''১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আজ অবধি দেখিতেছি যে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য (এবং বাঙ্গালা আধুনিক সাহিত্য) প্রধানত সাময়িক পত্রিকার আশ্রয়ে বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা গদ্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের প্রকাশপত্র বলিয়াই সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক-পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন, ভারতী, জ্ঞানাঙ্কুর, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, নবজীবন, সাহিত্য, সাধনা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও সবুজপত্র ইত্যাদির নাম বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়াছে।''[১]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে বেশ কিছু সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই সব সাময়িক পত্রের মধ্যে কিছু ধর্মীয় পত্রিকাও রয়েছে। তবে ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ইংরেজি ভাষায় এবং একজন ইংরেজের সম্পাদনায়। পত্রিকাটির নাম 'বেঙ্গল গেজেট', প্রকাশিত হয় ১৭৮৯ সালের ২৯শে

জানুয়ারি তারিখে। পত্রিকাটি বেশীদিন চলেনি, কারণ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের স্ত্রী এবং কয়েকজন পদস্থ লোকের বিরুদ্ধে আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশ করায় বছর দুয়েকের মধ্যেই পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। নানা কারণে ইংরেজ গভর্নমেন্ট সংবাদপত্রের উপর প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁরা মনে করতেন অধিকাংশ সংবাদপত্রের রচনাভঙ্গি এবং ভাষা নিম্নমানের এবং অশালীন। এই একটি কারণ ছাড়াও আরও কারণ হ'ল বিভিন্ন সময়ে সৈন্যদের নানাস্থানে যাতায়াত সম্পর্কিত সংবাদ যাতে অবাধে সংবাদপত্রে ছাপা না হ'তে পারে, সে কারণে লর্ড ওয়েলেসলি ১৭৯৯ সালের মে মাসে আইন প্রণয়নের দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করে নিয়ম করেন, যে কোনো ধরনের সংবাদ সাময়িকপত্রে প্রকাশ করবার পূর্বে সেক্রেটারির অনুমোদন নিতে হবে। এই নিয়ম না মানলে সম্পাদককে ইউরোপে নির্বাসিত হতে হবে। এই সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষে যত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে সেসব সংবাদপত্রের ভাষা ছিল ইংরেজি আর সম্পাদকমন্ডলীও ছিলেন ইউরোপীয়। পরবর্তীকালে লর্ড হেস্টিংস বিচার বিবেচনা করে সংবাদপত্রের সেন্সরের পদ তুলে দেন। এরপরই শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয় 'দিগ্‌দর্শন' সাময়িক পত্রিকা - জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় 'দিগ্‌দর্শন'ই প্রথম মাসিক সংবাদপত্র। কিন্তু পত্রিকাটি ছিল স্কুল পাঠ্য নির্ভর। সে কারণে স্কুল বুক সোসাইটি 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকার অনেকগুলি খন্ড ক্রয় করেন এবং 'দিগদর্শন'-এর আর একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের জন্য সম্পাদককে অনুরোধ করেন। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাময়িকপত্র থেকে জানতে পারি -"The Dig Durshuna. It has been suggested that certain articles in the monthly Dig-durshuna, might not be wholly uninteresting to our youth in general. As it appears reasonable, therefore, that nothing should be withheld from our Indian youth from which they can derive the slightest information, it is proposed in future to publish separately an English translation of each Number; and for the use of such youth as may wish to read it in both language, a few copies in both

so as to make the English agree; page for page with the Bengalee. An English translation of the Number already published having been requested, the publishing of the original work will in cosequence be suspended for a short reason till this can be complited .''[২]

পরবর্তী সময়ে 'দিগ্‌দর্শন'-এর তিনটি বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাংলা সংস্করণ, ইংরাজি-বাংলা সংস্করণ ও ইংরাজি সংস্করণ। 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশের মাস খানেকের মধ্যেই শ্রীরামপুর মিশন থেকে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ সালের ১৩মে প্রকাশিত হয় 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। পত্রিকার সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যান। যদিও শ্রীরামপুর মিশন থেকে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে উইলিয়ম কেরী বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না, কারণ সরকারের কোপ দৃষ্টি মিশনের উপর পড়তে পারে এই আশঙ্কায়। পরে অবশ্য তাঁর অনুমতি পাওয়া যায়। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক জন ক্লাক মার্শম্যান হলেও প্রকৃতপক্ষে দেশীয় পন্ডিতরাই রচনা প্রকাশ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ নিজ নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করতেন। তাই 'সমাচার দর্পণ'-এর ভাষা ছিল অনেক স্বচ্ছ ও সরল। দেশীয় পন্ডিতদের মধ্যে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 'সমাচার দর্পণ'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে থেকে দীর্ঘদিন সম্পাদনার কাজে সহায়তা করেছেন। পরবর্তী সময়পর্বে পন্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদনায় সহায়তা করেছিলেন। তিনি এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। সাহিত্য বিষয়ক রচনা ছাড়াও সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি বহু বিচিত্র বিষয়ই যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত হওয়ায়, সমকালীন যুগের ইতিহাসে যে পত্রিকাটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা অবশ্যস্বীকার্য। যাই হোক মার্শম্যান ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সাপ্তাহিক পত্রিকা অতীব দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করেন। 'সমাচার দর্পণ' যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই কারণেই মার্শম্যান এই পত্রিকার আরও একখানি দ্বিসাপ্তাহিক (১৮৩২) এবং একখানি ইংরেজি বাংলা দ্বিভাষিক রূপে প্রকাশ করেন। মার্শম্যান আরও দুটি পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে ভীষণ কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন, সে কারণে সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ'-এর

প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৮৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে বাঙালিদের উৎসাহ অনুপ্রেরণায় কোলকাতা থেকে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পদনায় নবপর্যায় 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা পুনরায় প্রকাশের পিছনে ইয়ং-বেঙ্গল দলের বিশেষ প্রভাব ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' বেশীদিন চলেনি। সম্ভবত ১৮৪৩ সালের প্রথম দিকেই এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৪২ সালের 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' পত্রে প্রকাশ ''Native Newspapers – we are happy to perceive that the Sumachar Durpun, which the Editor was constrained to discontinue at the close of last year for want of sufficient leisure to do it justice, has been taken up and continued in Calcutta"[৩]

তবে 'দর্পণ' নামের আকর্ষণের জন্য শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃপক্ষ তৃতীয় পর্যায় 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করবার সংকল্প গ্রহণ করে। অতএব ১৮৫১ সালের ৩রা মে শনিবার তৃতীয় পর্যায় 'সমাচার দর্পণ'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার মুখপত্রের সম্পাদকীয় বিবৃতিটি ছিল এইরূপ ঃ

''সমাচার দর্পণের নমস্কার। পাঠক মহাশয়েরদের সমীপে প্রাচীন দর্পণের নামে ও আকারপ্রকারে উপস্থিত হওয়াতে ভরসা করি অনেক পাঠক মহাশয় আমারদিগকে বহুকালীন বৃদ্ধ বন্ধু স্বরূপ দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবেন। যখন ১৮৪১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে দর্পণের অদর্শন হইল তখন পুনরুদয় হওনের প্রত্যাশা ছিল না পরন্তু দেখুন, পুনরুত্থিত হইলাম।''[৪]

যদিও সাধারণ মানুষের মঙ্গল সাধন করাই ছিল 'সমাচার দর্পণ'-এর উদ্দেশ্য। তবুও নবপর্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' মাত্র দেড় বছর চলবার পর এর প্রকাশ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের পাশাপাশি 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে একটি সাপ্তাহিক সাময়িকপত্রের উদ্ভব ঘটে। 'বাঙ্গাল গেজেটি' বাঙালি পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। পত্রিকাটির সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য প্রথম ফেরিস এন্ড কোম্পানির ছাপাখানায় বাংলা বই ছাপাতে শুরু করেন ১৮১৬ সালে। 'লক্ষ্মীচরিত্র',

'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'চাণক্যশ্লোক' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সব গ্রন্থের মধ্যে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটিই বোধহয় প্রথম সচিত্র বাংলা পুস্তক। অতঃপর ১৮১৮ সালে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রেস স্থাপিত হলে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বাঙ্গাল গেজেটি' তার নিজস্ব ছাপাখানা থেকেই প্রকাশিত হ'তে থাকে। ১৮১৮ সালের ১৪মে থেকে ৯ই জুলাই তারিখের মধ্যে কোনো এক সময় 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়েছিল। এই সাময়িক পত্রিকায় সরকারী বিজ্ঞাপন, আইন ও কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত নানা সংবাদ প্রকাশিত হ'ত। এছাড়াও সরল বাংলায় স্থানীয় লোকের রুচিকর নানা কথাও স্থান পেত। এই পত্রিকার সডাক মাসিক মূল্য ছিল দুই টাকা। সমকালীন সাময়িকপত্র যেমন Asiatic Journal (July 1819) থেকে জানা যায় যে, ১৮১৮ সালে প্রকাশিত সহমরণ বিষয়ে রামমোহন রায়ের 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সম্বাদ' 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। বছর খানেক চলবার পর 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ের দ্বিতীয় মাসিক সাময়িকপত্র হল 'গস্‌পেল মাগাজীন'। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ ১৮১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। প্রকাশক B.A.M.S. বা Baptist Auxiliary Missionary Society। সাময়িকপত্রের মধ্যে 'গস্‌পেল মাগাজীন' পত্রিকায় সর্বপ্রথম খ্রিস্টের তত্ত্বকথা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটি দ্বিভাষিক অর্থাৎ বাংলা ও ইংরাজি দুই ভাষাতেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হ'ত। পত্রিকার প্রতি পৃষ্ঠার বাম স্তম্ভে ইংরাজি এবং ডানদিকের স্তম্ভে ঐ ইংরাজির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হ'ত। 'গস্‌পেল মাগাজীন' যে বছর প্রথম প্রকাশিত হয় তার পরের বছর থেকে অর্থাৎ ১৮২০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে পত্রিকাটির বাংলা সংস্করণও প্রকাশিত হতে থাকে, তবে রচনার সংখ্যা দ্বিভাষিক সংস্করণের তুলনায় বাংলা সংস্করণে কম থাকত।

সময়ের চাহিদা অনুসারে একেক সময় একেকটি সাময়িকপত্রের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু 'ব্রাহ্মণ সেবধি' সাময়িকপত্রের উদ্ভব বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাময়িকপত্র থেকে জানতে পারি, ''কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশ হইতে কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত' একখানি পত্র ১৪ জুলাই ১৮২১ তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় এই পত্রখানিকে মিশনারীদের তরফ হইতে হিন্দুধর্মের প্রতি অযথা

আক্রমণ বোধে প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন।''[৫] অতএব রামমোহন পন্ডিত শিবপ্রসাদ শর্মা ছদ্মনামে 'সমাচার দর্পণ'-এ যে প্রশ্নগুলি প্রকাশিত হয়েছিল সেই প্রশ্নগুলির উত্তর লিখে 'সমাচার দর্পণ'-এর সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেন প্রকাশ করবার জন্য। কিন্তু 'সমাচার দর্পণ'-এর সম্পাদক রামমোহন রায়ের পাঠানো উত্তর প্রকাশ করেননি। প্রকাশ করতে না পারার কারণ স্বরূপ বলেছেন ''শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শর্ম্মা প্রেরিত পত্র এখানে পঁহুছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্ব্ব সমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই।''[৬]

অতএব রামমোহন রায় শিবপ্রসাদ শর্মার ছদ্মনামে 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির এক পৃষ্ঠায় বাংলা এবং পরের পৃষ্ঠায় তার ইংরেজি অনুবাদ থাকত। পত্রিকাটি খুব বেশীদিন চলেনি। তবে মিশনারীদের পক্ষ থেকে হিন্দুধর্মের প্রতি অযথা আক্রমণকে প্রতিবাদ করবার জন্যই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। কারণ প্রথমদিকে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রায়শ হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতা এবং কুলীনদের প্রতি কটাক্ষ করে পত্র প্রকাশিত হ'ত।

'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার পর বাঙালির পরিচালিত একটি বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশের অভাব অনেকেই অনুভব করেন। আর তার জন্যই কোলকাতা কলুটোলার অধিবাসী দেওয়ান তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে মিলে ১৮২১ সালের ৪ ডিসেম্বর (২০ অগ্রহায়ণ ১২৯৮) তারিখে 'সম্বাদ কৌমুদী' শিরোনামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'সম্বাদ কৌমুদী' সাপ্তাহিক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হলে 'সমাচার দর্পণ'-এর সম্পাদক আনন্দিত হন এবং বলেন - ''সম্বাদ কৌমুদী'। এই মাসে সম্বাদ কৌমুদী নামে এক বাঙ্গালি সমাচার পত্র মোং কলিকাতাতে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে ইহাতে আমরা অধিক আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়াছি যেহেতুক দর্পণ বল কিম্বা কৌমুদী বল অথবা প্রভাকর বল

যাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের জ্ঞান সীমা বিস্তার হয় তাহাতে আমরা তুষ্ট ... ।''[৭] সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রথম প্রথম মঙ্গলবারেই প্রকাশিত হ'ত। ১৬টি সংখ্যা প্রকাশের পর থেকে প্রতি মঙ্গলবারের পরিবর্তে শনিবার প্রকাশিত হতে থাকে। 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম সংখ্যা যখন প্রকাশিত হয় তখনই বাংলাদেশের পাঠকদের উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাষায় জানানো হয় যে ধর্মনীতি বিষয়ক আলোচনা, রাষ্ট্রবিষয়ক আলোচনা, আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী দেশ বিদেশের সংবাদ প্রকাশ - জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত প্রেরিত পত্রাবলী প্রকাশ - মোটকথা লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র প্রকাশনার একমাত্র উদ্দেশ্য। 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকার মাথায় এই শ্লোকটি ছাপা হতো।

দর্পণে বদনং ভীতি দীপেন নিকটস্থিতং।
রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ।।

সম্বাদ কৌমুদীর সঙ্গে রামমোহন রায় ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি এই পত্রিকার অন্যতম লেখকও ছিলেন এবং সতীদাহ নিবারণ বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকায় লিখেছেন। এই কারণে পত্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণের রক্ষণশীল মনোভাব আহত হয় এবং তিনি পত্রিকার সংস্রব থেকে দূরে সরে দাঁড়ান। অতঃপর পর্যায়ক্রমে একাধিক সম্পাদকের সম্পাদনায় দশ বছর পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

১৮২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'পশ্বাবলী' নামে একটি মাসিক পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রকাশক স্কুল বুক সোসাইটি। পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য হ'ল যে প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করে জন্তুর বিবরণ থাকতো আর পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় সেই জন্তুর কাঠ-খোদাই চিত্র থাকতো। লসন্ নামক একজন পাদরি কাঠ খোদাইয়ের কাজে বিশেষ দক্ষ ছিলেন, পত্রিকার চিত্রগুলি সেই পাদরি লসনের। 'পশ্বাবলী' পত্রিকার ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় বাঘ ও বিড়ালের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সংখ্যা দুটি প্রকাশিত হয়েছিল অনেক পরে। পাদরি লসনের মৃত্যুতে 'পশ্বাবলী' আর বেশিদূর এগোতে পারেনি। ছয়টি সংখ্যা প্রকাশের পরই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে স্কুলের ছাত্রদের পরিতোষিক

পুস্তক হিসেবে গ্রহণীয় হতে পারে ভেবে স্কুল বুক সোসাইটি 'পশ্বাবলী' পত্রিকার ছয়টি সংখ্যা পুস্তকের আকারে একত্রে প্রকাশ করে ১৮২৮ সালে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে 'পশ্বাবলী' পত্রিকা পরিচালনা করেন হিন্দুকলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র। মনে করা হচ্ছে যে তাঁর পরিচালনায় 'পশ্বাবলী'র প্রথম সংখ্যায় 'কুক্কুরের বৃত্তান্ত' প্রকাশিত হয়েছে। রামচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় 'পশ্বাবলী'র মাত্র ১৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তাও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং 'পশ্বাবলী' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। 'সম্বাদ কৌমুদী' সাপ্তাহিক সাময়িক পত্রিকার ১৩টি সংখ্যা প্রকাশের পর সদস্যদের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়, ফলে সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি কাজ নিয়ে থাকতে ভালোবাসেন বলে শীঘ্রই একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং ঐ ছাপাখানা থেকে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৮২২ সালের ৫ই মার্চ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। 'সম্বাদ কৌমুদী'তে রামমোহন রায়ের যেসব প্রগতিমূলক মতবাদ প্রকাশিত হ'ত, সেই সব মতবাদের বিরোধিতা করাই ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্য। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করলে অনেক রক্ষণশীল হিন্দু 'সম্বাদ কৌমুদী'র গ্রাহক পদ ত্যাগ করে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র গ্রাহক হন। ভবানীচরণ রক্ষণশীল হলেও যুক্তিবাদকে এড়িয়ে চলেননি, কিংবা তিনি আধুনিক যুগকেও অস্বীকার করেননি। ফলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'কলিকাতা কমলালয়' এবং 'নববাবু বিলাস' এর মতো ব্যঙ্গধর্মী সামাজিক নক্শা সমাচার চন্দ্রিকার পৃষ্ঠাকে অলঙ্কৃত করেছিল। 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রাচীনপন্থী সমাজের প্রতিভূ ছিল। 'সম্বাদ কৌমুদী' এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা'র মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে বাদ প্রতিবাদ চলেছিল তা সমকালীন বাংলার সমাজজীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক বিষয়েও 'সমাচার চন্দ্রিকা' যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছে। 'কলিকাতা কমলালয়' ও 'নববাবু বিলাস' রচনা দুটির মধ্যে দিয়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে সহজ সাবলীল সমাজচিত্র অঙ্কন করেছেন পরবর্তী সময়পর্বে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র মধ্য

দিয়ে তারই ক্রমপরিণতি দেখা যায়। এককথায় বলা যায় যে এই যুগের একজন সাংবাদিকের হাতেই বাংলা গদ্যের নতুন ঐতিহ্যের জন্মলাভ করেছিল। যা হোক ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত 'সমাচার চন্দ্রিকা' বর্তমান ছিল।

'সমাচার চন্দ্রিকা'-র পরই অন্যতম উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর'। কিন্তু এই পত্রিকার পূর্বে বাংলা ভাষায় কয়েকটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। 'সম্বাদ তিমির নাশক' সাপ্তাহিক সাময়িকপত্ররূপে ১৮২৩ সালে প্রকাশিত হয় কৃষ্ণমোহন দাসের সম্পাদনায়। পত্রিকাটি সাতবছর ধরে সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হয়, তারপর সাত বছরের পর থেকে সপ্তাহে দুবার করে প্রকাশিত হতে থাকে। 'সম্বাদ তিমির নাশক' রক্ষণশীলদের পক্ষে এবং উদারপন্থীদের বিপক্ষেই সব সময় প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি বর্তমান ছিল। তারপর এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

পরবর্তী সাপ্তাহিক সাময়িকপত্র 'বেঙ্গল হেরল্ড' প্রকাশিত হয় ১৮২৯ সালে। এই পত্রিকার সহচর ছিল 'বঙ্গদূত'। সম্পাদক নীলরত্ন হালদার। 'বঙ্গদূত' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ১৮২৯ সালের ১০মে রবিবার প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার পর থেকে এই পত্রিকা প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হতে থাকে। 'বেঙ্গল হেরল্ড' পত্রিকাটি বাংলা, ইংরেজি, ফার্সী ও নাগরী এই চারটি ভাষায় প্রকাশের লাইসেন্স পেলেও কেবলমাত্র ইংরেজিতেই প্রকাশিত হ'ত। এই বিষয়ে 'বেঙ্গল হেরল্ড' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত অনুষ্ঠান পত্র থেকে জানা যায় -- ''Prospectus of the Bengal Herald ..... A Native paper to be printed in the Bengalee, Persian and Nagree character, will be subjoined, but distinct, and under the superintendance of the most talented Hindoos, translations from whose contributions will be occasionally made.

The English portion of the Herald will contain sixteen pages, royal quarto, and the Native Eight, which will admit of separate subscription, the former at the rate of Two rupees and the later one, monthly.

To be printed and published every Saturday night, for the proprietors.

R.M. Martin, Rammohun Roy
Dwarkanath Tagore, Neel Rutton Holder, and
Prussuna Comar Tagore, Rajkissen Sing ''[৮]

নীলরত্ন হালদার বেশকিছুদিন পর্যন্ত 'বেঙ্গল হেরল্ড' পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। নীলরত্ন হালদার কিছুদিন চালাবার পর অবসর গ্রহণ করলে ভোলানাথ সেন 'বঙ্গদূত' পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখরা এই পত্রিকার পরিচালক মন্ডলীর সদস্য ছিলেন। 'বঙ্গদূত' পত্রিকাটিতে সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা ছাড়াও রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হ'ত। ভোলানাথ সেনের মৃত্যু হলে মহেশচন্দ্র রায় কিছুদিন পত্রিকাটি পরিচালনা করেছিলেন।

১৮২৯ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা' এবং 'ব্যবহারদর্পণ'। এই পুস্তকের প্রথম খন্ড শ্রাবণ মাসে আর দ্বিতীয় খন্ড পৌষ মাসে 'তিমির নাশক' যন্ত্র থেকে কালাচাঁদ রায়ের পরিচালনায় প্রকাশিত হয়। 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা'র প্রথম খন্ডে দুটি প্রবন্ধ আছে ''Colonization কোলোনাইজেসিয়ান অর্থাৎ এতদ্দেশে ইংরাজ লোকের বসতি এবং জমীদারী প্রভৃতি কর্ম্ম করণ বিষয়; ২ পারস্ব ভাষা পরিবর্ত্তনে ইংরাজী ভাষা আদালতে প্রচলিত হইবার বিষয়ে বিবেচনা''।[৯] এই উভয় বিষয়েই 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা' তীব্র বিরোধিতা করেছে। কারণ পত্রিকাটি ছিল রক্ষণশীলদের পক্ষে।

১৮৩০ সালের জুন মাসে সাপ্তাহিক সাময়িকপত্ররূপে 'শাস্ত্রপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়। নাম থেকেই বোঝা যায় যে কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় আলোচনাই এই পত্রিকায় স্থান পেত। বেদ, বেদাঙ্গ , পুরাণাদি থেকে শ্লোকের প্রকৃত অর্থ এবং তার ফল সংক্ষেপে সংগৃহীত হয়ে সাধারণের বোঝার সুবিধার্থে প্রকাশিত হ'ত। পত্রিকাটির প্রকাশ হয়তো মাঝে বন্ধ ছিল, তাই ১৮৩১ সালের গোড়ার দিকে নবপর্যায়ে প্রকাশের কথা জানা যায়।

প্রায় একই সময়ে লক্ষ্মীনারায়ণ রায় পূর্ণিয়ার জজ-পন্ডিত নিযুক্ত হন এবং তার পরেই পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে 'সংবাদ প্রভাকর' এর অবদান অবিস্মরণীয়। ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা। ১৮৩১ সালের ২৮শে জানুয়ারী সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর জয়যাত্রা শুরু। মাঝে কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ১৮৩৬ সালের ১০ই আগস্ট থেকে বারত্রয়িক অর্থাৎ সপ্তাহে তিনবার করে প্রকাশিত হতে থাকে। ধারাবাহিকভাবে তিনবছর চলবার পর ১৮৩৯ সালের ১৪ই জুন তারিখ থেকে 'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা ভাষায় প্রথম দৈনিক সংবাদপত্ররূপে বাংলা সংবাদপত্রের জগতে নতুন ধারার প্রবর্তন করে। এই পত্রিকা বঙ্গবাসীদের নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। কেননা 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা নবীন ও প্রবীন উভয় সমাজের মধ্যে সংযোগ রক্ষার কাজ করেছে। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠাতেই প্রথম সাহিত্য বিষয়ক রচনা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর জন্যই সাংবাদিক রূপে ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভা তৎকালীন যুগের পক্ষে বিস্ময়কর বলে মনে হয়। ইংরেজি শিক্ষা তো দূরের কথা পুঁথিগত শিক্ষাও ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ ছিল না, কিন্তু স্বাধীনতাবোধ, স্বদেশপ্রেম ভালোমন্দের বিচার প্রভৃতি বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দেশ বিদেশের সংবাদ সঙ্কলন করে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে দেশবাসীকে বাইরের বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত করবার প্রয়াস 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠাতেই প্রথম দেখা যায়। এই পত্রিকায় যাঁরা লিখতেন তাঁদের অনেকেই ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যুগের বাণীকে ঈশ্বর গুপ্ত অনুভব করতে পেরেছিলেন বলে তাঁর সংবাদপত্র যুগোচিত হয়ে উঠেছিল। সংবাদ, রাজনৈতিক মন্তব্য, ইংরেজ শাসনের সমালোচনায় ও আধুনিক শিক্ষা প্রসারে ঈশ্বর গুপ্ত যথেষ্ট মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন, বাংলাদেশের সমাজধর্ম, সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়ে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছে।

17 DEC 2012

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য কবিওয়ালদের বিবরণী এবং তাদের কবিগানগুলি সঙ্কলন ও প্রকাশ করে ঐ যুগের একটা বিশেষ ইতিহাসকে রক্ষা করার কৃতিত্ব ঈশ্বর গুপ্ত

241089



LIBRARY NBU DARJEELING

অর্জন করেছেন। তাছাড়া 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বাংলা সাহিত্যের তিন ধারার তিনজন বিশিষ্ট লেখকের হাতে খড়ি হয়েছিল। এই তিন বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন কাব্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নাটকে দীনবন্ধু মিত্র। এই সব লেখক ব্যতীত সে যুগের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার লেখক গোষ্ঠী ভুক্ত ছিলেন।

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের পরেও বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলির অধিকাংশই বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। এদের মধ্যে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৩১ সালের ১৮ই জুন প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপত্র। সেজন্য হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররাই বিভিন্ন সময়ে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সাহিত্য বিভাগ পরিচালনা করেছেন। বেদ অধ্যয়ন ও শ্রবণ শূদ্র ও স্ত্রীলোকদের পক্ষে নিষিদ্ধ এই সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় লেখা হ'ত। যা হোক দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায় সম্পাদক হলেও পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদনা করতেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। একাধিক ব্যক্তি 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায়ের পর রামকৃষ্ণ মল্লিক এবং মাধবচন্দ্র মল্লিক 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা পরিচালনা করেন। ১৮৩৩ সালের ১৫ই জানুয়ারী থেকে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকাটি ইংরেজি বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হতে থাকে। প্রায় দশ বছর চলার পর ১৮৪০ সালের নভেম্বর মাস থেকে পত্রিকাটির প্রচার বন্ধ হয়।

আরও অনেক নামি অনামি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটির সম্পর্কে আলোচনা করলে দীর্ঘায়িত হতে পারে। তাই আপাতত প্রধান প্রধান কয়েকটি পত্রিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল। এবার আমরা আমাদের আলোচ্যপর্বে প্রবেশ করব। বাংলা সাময়িক পত্রিকার এই পর্বে আমার আলোচনার বিষয় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা।

উনিশ শতকে নবীনদের সঙ্গে প্রবীনদের আদর্শগত সংঘাত এবং মতবিরোধ সবসময় লেগে থাকতো। তাই উনিশ শতকের তিরিশের গোড়ায় যাঁরা ধর্মসভা স্থাপন করেন, তাঁদের সঙ্গে ডিরোজিওর প্রগতিবাদী শিষ্যদের ভাবসংঘাত লেগে থাকতো। এই

বিরোধ কেবল পাশ্চাত্য আদর্শের সঙ্গে এদেশীয় আদর্শের পার্থক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তার চেয়েও বেশী ছিল এদেশীদের জীবনাদর্শের প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে, এদেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি পাশ্চাত্যবাসীর অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা ইত্যাদির মধ্যে। শিক্ষিত তরুণেরা দেশের প্রতি উন্নাসিক ছিলেন, তাদের সেই উন্নাসিক মনোভাবকে স্বদেশের প্রতি চালনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সামাজিক ঐতিহাসিক দিক থেকেও এর প্রয়োজন ছিল। ইতিহাসের সেই দাবি পূরণ করেছিল 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৯ সালে। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠার পূর্বে আরও একটি এইরকম সভা দেশে স্থাপিত হয়েছিল। তা হল 'আত্মীয় সভা'। রামমোহন রায় ১৮১৫ সালে এই সভা স্থাপন করেন। এই 'আত্মীয় সভা'ই এদেশের সর্বপ্রথম সভা। এর পূর্বে এদেশে আর কোনো সভা স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায় না।

১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়ম জোনস্-এর উদ্যোগে 'এসিয়াটিক সোসাইটি' নামে প্রাচীনতম বিদ্বৎসভা স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু 'এসিয়াটিক সোসাইটি' তার প্রতিষ্ঠা কাল থেকে ক্রমান্বয়ে ৪৫ বছর ধরে অর্থাৎ ১৮২৯ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয়দের ঐতিহ্য ও আদর্শেরই প্রচার করেছে। এদেশীয় আদর্শের কথা তাতে জানতে পারা যায় না। অর্থাৎ এসিয়াটিক সোসাইটি ''Represented the Elite of the European Community in Calcutta at that time।''[১০] কাজেই এদেশীয় লোকের সামাজিক সভা বা বিদ্বৎসভার মধ্যে সবার প্রথমে আমরা রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'কেই রাখতে পারি। 'আত্মীয় সভা'তে একদিকে যেমন বেদপাঠ করা হ'ত, ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া হ'ত তেমনি নানাবিধ সমাজ সংস্কার মূলক আলোচনা অর্থাৎ সমাজে প্রচলিত কুপ্রথা ও কুসংস্কার বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা হ'ত এই 'আত্মীয় সভা'য়।

এই 'আত্মীয় সভা' আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি কারণ আধুনিক শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র, 'হিন্দুকলেজ' তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার দুবছর আগেই 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রামমোহন রায় পাশ্চাত্য বিভিন্ন সভাসমিতির দ্বারা যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তেমনি এদেশে প্রতিষ্ঠিত 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন। এই সভা আধুনিক গণতান্ত্রিক সভাসমিতির মধ্যে পথিকৃতের কাজ করেছিল। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই কলেজে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদল মধ্যযুগীয় ভাবধারা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক ভাবধারায় দীক্ষা নিতে চাইল। এই তরুণদের দ্বারা প্রবীনরাও প্রভাবিত হয়ে সমাজ-সংস্কৃতির উদ্দেশ্যে সভাসমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে 'গৌড়ীয় সমাজ' (১৮২৮) নামে নবীন ও প্রবীনদের সভা স্থাপন করেন। প্রায় একই সময়ে শিক্ষিত নবীনদের 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' (১৮২৮-১৮২৯), পরবর্তী সময়ে গোঁড়া হিন্দুদের 'ধর্মসভা' (১৮৩০), শিক্ষিতদের 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা' (১৮৩২), 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (১৮৩৮) প্রভৃতি সভা-সমিতির নাম বিশেষভাব উল্লেখযোগ্য।

Freedom of Association স্থাপন এর উৎসাহ এদেশে যেমন উনিশ শতকে দেখা দিয়েছিল, পাশ্চাত্য দেশে এক শতাব্দী পূর্বে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে অনুরূপ লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। এদেশে পরবর্তীকালে রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'র উত্তরাধিকার রূপে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন (১৮৩৯ সালের অক্টোবর মাসে) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র নামকরণ ছিল 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। এই সভা স্থাপনের অন্যতম কারণ হল ''১৭৫২ (১৮৩০ খৃষ্টাব্দে) ডফ সাহেব রামমোহন রায়ের বিশেষ সাহায্যে স্বপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের পত্তন করতে পেরেছিলেন। ..... তিনি প্রথমবার স্বদেশে ফিরে যান এবং সেখানে ১৭৬১ শকে (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে) তিনি ''India and Indian's missions'' (ভারত ও ভারতের মিশন সকল) নামক প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম্ম এবং তৎসঙ্গে কৃতজ্ঞতার পাশ কাটাইয়া ব্রাহ্মসমাজেরও প্রতি তীব্র আক্রমণ ও কটূক্তি বর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নি।

এই ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে খুবই আঘাত লেগেছিলো। তাঁর হৃদয়ে ডফসাহেব কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নিন্দাবাদের প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু সে সময়ে না ছিল এমন কোন কাগজ যাতে তিনি আপনার মনোভাব সকল ব্যক্ত করতে পারেন, আর না ছিল এমন কোন বন্ধুবান্ধব যাঁদের সঙ্গে তিনি এ

বিষয়ে পরামর্শ করতে পারতেন। ১৭৬১ শকে 'তত্ত্ববধিনী সভা' সবেমাত্র স্থাপিত হয়েছিল।''[১১]

'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' থেকে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'য় পরিবর্তন প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে জানা যায় যেটুকু তথ্য তা একদিকে সভার নামের পরিবর্তন অপর দিকে 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' স্থাপন সম্পর্কিত সংবাদ। ''সভ্যগণ সকলে সকালে স্নান করিয়া সভাধিরূঢ় হইলে পর দেবেন্দ্রনাথ কঠোপনিষদের একটী মন্ত্র অবলম্বনে প্রথম ব্যাখ্যান বিবৃত করেন। ব্যাখ্যান শেষ হইয়া গেলে তাঁহার প্রস্তারক্রমে এই সভার নাম তত্ত্বরঞ্জিনী রাখা হইল। শাস্ত্র অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য স্থির হইল। দেবেন্দ্রনাথই এই সভার সম্পাদক হইলেন - তিনিই ইহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই সভা স্থাপনের ফলে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মতত্ত্বাদি বিষয়ে স্বাধীন ভাবে বক্তৃতা করিতে পাইয়া যে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাঁহার আত্মজীবনী হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আহুত হইয়া আচার্য্যপদে নিযুক্ত হয়েন। তাঁহারই প্রস্তাবক্রমে সভার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া ''তত্ত্ববোধিনী'' রাখা হইল।''[১২]

এই প্রসঙ্গে আমরা আরও জানতে পারছি যে প্রতিমাসের প্রথম রবিবার সন্ধ্যার সময় এই সভার অধিবেশন হ'ত। সুতরাং একথা সহজেই অনুমেয় যে 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' নামটি প্রথম একমাস সময় সীমা পর্যন্ত বর্তমান ছিল। এই 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'র প্রধান লক্ষ্য এবং মহত্তম কর্ম ছিল ধর্ম সংস্কার। তাছাড়া সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কারও ছিল এই সভার আনুষঙ্গিক কর্তব্য। এই সম্পর্কিত সংবাদও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে পাওয়া যায়।

''দেবেন্দ্রনাথ তাঁর নেতৃত্বের প্রথমাবস্থায় বেদ ও উপনিষৎকেই ব্রাহ্মসমাজের পথপ্রদর্শক ও বলতে গেলে সর্ব্বস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত করে এদেশের শাস্ত্রসমূহের মর্ম্ম প্রচার করাকেই তাহার অন্যতর উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট করে দিলেন এবং কালক্রমে দেবেন্দ্রনাথই সেই সভার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের পরিণয় সাধিত করলেন। আবার তিনি সেই তত্ত্ববোধিনী সভার ছায়াতে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা

স্থাপিত করে তার আগাগোড়া শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে পরিচালিত করা স্থির করে দিলেন।''[১৩]

মাত্র দশজন সভ্য নিয়ে এই সভা স্থাপিত হয়। ক্রমশ এর সভ্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রথমদিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর একতলার একটি প্রশস্ত ঘরে সভার অধিবেশন হ'ত। পরে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র অধিবেশনের জন্য সুকিয়া স্ট্রীটে একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। এই সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের মাধ্যমে অক্ষয়কুমার দত্ত-এর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের সংযোগ হয় এবং অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সভ্য হন। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে রাত্রিকালে সভার অধিবেশন হ'ত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই সভায় আচার্যের আসন গ্রহণ করে উপদেশ দিতেন। এই সভাতে যোগদানকারী অন্যান্য সভ্যদেরও বক্তৃতা করবার অধিকার ছিল। তবে বক্তৃতা করবার বিষয়ে বিশেষ নিয়ম ছিল এই যে, যিনি সকলের আগে বক্তৃতা লিখে সম্পাদকের হাতে দিতেন তিনিই সভায় বক্তৃতা পাঠ করবার সুযোগ পেতেন। তৃতীয় বছরে এই 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা হল - ''এই ক্ষণে ইংলন্ডীয় ভাষার আলোচনায় বিদ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই, এবং এতদ্দেশস্থ লোকের মনের অন্ধকারও অনেক দূরীকৃত হইয়াছে। এইক্ষণে মূর্খ লোকদিগের ন্যায় কাষ্ঠ লোষ্ট্রেতে ঈশ্বর-বুদ্ধি করিয়া তাহাতে পূজা করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। বেদান্তের প্রচার অভাবে, ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্য-স্বরূপ, সর্ব্বগত, বাক্যমনের অতীত, ইহা যে আমাদের শাস্ত্রের মর্ম্ম, তাহা তাহারা জানিতে পারে না। সুতরাং আপনার ধর্ম্মে এ প্রকার শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান না পাইয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের শাস্ত্রে তাহা অনুসন্ধান করিতে যায়। তাহাদিগের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমাদিগের শাস্ত্রে কেবল সাকার উপাসনা, অতএব এ প্রকার শাস্ত্র হইতে তাহাদিগের যে শাস্ত্র উত্তমবোধ হয়, সেই শাস্ত্র মান্য করে। কিন্তু যদি এই বেদান্ত-ধর্ম্ম প্রচার থাকে, তবে আমাদিগের অন্য ধর্ম্মে কদাপি প্রবৃত্তি হয় না। আমরা এই প্রকারে আমাদিগের হিন্দুধর্ম্ম রক্ষায় যত্ন পাইতেছি।''[১৪] এই সাম্বৎসরিক সভার উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার পর

১৭৬৪ শকে (১৮৪২ সাল) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। যেহেতু ব্রহ্মোপাসনার জন্যই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত, সে কারণে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'কে মিলিয়ে দেবার জন্য সংকল্প করেছিলেন। অতঃপর 'তত্ত্ববোধিনী সভা'ই ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানের ভার নেয়। এর পর থেকে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মাসিক সান্ধ্যকালীন উপাসনা বন্ধ হয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে ব্রাহ্মসমাজের মাসিক উপাসনা ধার্য হয় প্রাতঃকালীন সময়ে এবং আশ্বিন মাসের ২১ তারিখের সাম্বৎসরিক সভা পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মসমাজের গৃহ প্রতিষ্ঠার দিবস ১১ মাঘ তারিখে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্তিত হয়।

১৭৫০ শকের ভাদ্রমাসে জোড়াসাঁকোতে অবস্থিত কমল বসুর বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয় এবং সেই বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার করাই 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র লক্ষ্য ছিল। সে কারণে এই লক্ষ্য সুসম্পন্ন করবার জন্য একটি যন্ত্রালয় এবং একটি পত্রিকা অতি আবশ্যক হয়ে পড়ল। এ প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বলা হয়েছে -

''ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্মিলনের ফলে তত্ত্ববোধিনী সভা সুপ্রতিষ্ঠিত হোল এবং সেই সঙ্গে অন্ততঃ ছোটখাটো একটা দল বেঁধে গেল, তখন দেবেন্দ্রনাথ একখানি মাসিক পত্র প্রকাশের প্রস্তাব করতে সাহসী হলেন।''[১৫]

তাছাড়া 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র অনেক সভ্য কাজ উপলক্ষে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন। তাঁরা নানা কারণে সভায় উপস্থিত হতে পারেন না। সভায় কখন কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে সে সংবাদও তাঁরা ঠিকমত পান না। বিশেষত ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যা সভ্যদের অনেকেই শুনতে পান না। অথচ এই সব ব্যাখ্যার প্রচার হওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে ১৭৬৫ শকাব্দে (১৮৪৩ সালে) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। সভ্যদের মধ্য থেকে অক্ষয়কুমার দত্তকে সম্পাদক মনোনীত করা হয়। তাঁর সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আশানুরূপ উন্নতি লাভ করে।

''এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল''-এর আদর্শে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি গ্রন্থ-কমিটি গঠন করেন। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' হতে প্রকাশের উপযোগী গ্রন্থ

ও প্রবন্ধ নির্বাচনের ভার দেওয়া হয় এই কমিটির উপর। দেবেন্দ্রনাথ এই কমিটির অধ্যক্ষ এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদক হলেন। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ মনস্বীবর্গ বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থকমিটির সদস্য ছিলেন। অধিকাংশ সদস্যের মতে যা প্রকাশযোগ্য বলে মনে হ'ত তাই পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ত বা পুস্তকাকারে ছাপা হ'ত। সহজ অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় গুরু বিষয়ের আলোচনার পথপ্রদর্শক এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। লোকহিতকর বিভিন্ন আন্দোলনের মূল আমরা এই পত্রিকার আলোচনার মধ্যে পাই। শিক্ষায় সাবলম্বন, মিশনারীদের আক্রমণ হতে স্বধর্ম ও স্বধর্মীদের রক্ষা, স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, সুরাপান নিবারণ, শারীরিক শক্তির উন্মেষ, নীলকরের অত্যাচার, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ নির্ণয়, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গবাসীদের প্রেরণা দিয়েছিল। এককথায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে সে যুগের চিন্তানায়ক বলা চলে। এতদ্ব্যতীত ''তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আর একটি বিষয়ের সূত্রপাত করে বঙ্গের তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজকে চমকিত করে তুলেছিল। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানের বিষয় নিয়মিত রূপে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হওয়া সেকালের লোকেদের কাছে খুবই নূতন বোধ হয়েছিল। ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সৃষ্টবস্তুর বর্ণনা ও অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করবার অঙ্গীকার সূত্রে বিজ্ঞান বিষয়ক নানা প্রবন্ধ সচিত্র হয়ে পত্রিকার অঙ্গ ভূষিত করতে লাগল। ... সকলেই স্বরচিত প্রবন্ধ মুদ্রিত আকারে দেখতে ভালোবাসেন। পত্রিকায় তার পথ যখন উন্মুক্ত হোল, তখন তাহা যে লেখকপদে অভিষিক্ত হবার অভিলাষীদের খুব আদরের বস্তু হবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি?''[১৬]

অক্ষয়কুমার ''তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করাতে যে মানুষ যে কার্য্যের উপযোগী যেন তাঁহার হস্তে সেই কার্য্যই আসিল। তিনি পদোন্নতি ও ধনাগমের বাসনা পরিত্যাগপূর্বক নিজের ও দেশীয়গণের জ্ঞানোন্নতি সাধনে দেহমন নিয়োগ করিলেন। তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্রসকলের অবস্থা কি ছিল এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য জগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না

বলিয়া থাকা যায় না। ... ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও (তখন) এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত, তাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারে না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল, তখন তাহারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন।''[১৭]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সমাজ সংস্কার বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। হিন্দু বিবাহ, স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রী শিক্ষা ইত্যাদির স্বপক্ষে এবং বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির বিপক্ষে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করেছে। দ্বিধা ভয় ও সংশয়ে দোলায়মান মন নিয়ে সংগ্রাম করেনি। এই সংগ্রামের মূলে অবশ্যই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছাড়াও আরো দুজন দুঃসাহসী ব্যক্তি - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত-এর অনুপ্রেরণা ছিল সবসময়। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভিতর দিয়েই বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কার মূলক কাজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর পাশে তখন নির্ভীক সেনাপতির মতো তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর ধারালো লেখনী নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই বিদ্যাসাগর প্রথম 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদবিষয়ক প্রস্তাব'টি প্রকাশ করেন, এখানেই পত্রিকার ঐতিহাসিক গৌরব।

তবে ধর্ম প্রচারই ছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য। কারণ গত শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে খ্রিস্টান মিশনারীরা নানাভাবে হিন্দুধর্মের নিন্দা এবং খ্রিস্টান ধর্মের জয়গান করতে থাকেন। এতেও নিরস্ত্র না হয়ে তারা হিন্দু সন্তানদের খ্রিস্টান করতেও লেগে গেলেন। আর এসব বিষয়েও অগ্রণী ছিলেন আলেকজান্ডার ডাফ। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মারফত ডাফ প্রমুখ মিশনারীদের অভিসন্ধির বিরুদ্ধে লেখনী চালাতে আরম্ভ করেন। এই একটি কারণ ছাড়াও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের আরও কারণ রয়েছে। পত্রিকার সম্পাদক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই সেই সম্পর্কিত কারণ দর্শিয়েছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যেহেতু ব্রাহ্মধর্মের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে সেজন্য ব্রাহ্মধর্মের সভ্যদের কথাও ভাবতে হয়েছে। কারণ তাঁরা

অনেকেই দূর দেশে থাকেন বলে নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মধর্মের আলোচনায় যোগদান করতে পারেন না। আবার কোনো পত্রিকা নতুন প্রকাশিত হচ্ছে দেখে সাধারণ মানুষের মনেও অনেক কৌতূহল থাকে, এ দুয়েরই উত্তর সম্পাদক মহাশয় তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধে দিয়েছেন -- ''কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য্য অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন, অতএব তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎ পত্রিকার সৃষ্টি করিলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এস্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

''তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্ব্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন এবং উন্নতি কি প্রকারে হইবেক? অতএব তাঁহাদিগের এ সকল বিষয়ের অবগতি জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য্যবিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।

''অনেক সভ্য দূরদেশ বশত বা শরীরগত অসুস্থতা হেতু বা কোন কার্য্যক্রমে অথবা অন্য কোন দৈববিপাকে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন, বিশেষত তাঁহাদিগের নিমিত্ত উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবেক।

''মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাঁহা এই ক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাঁহার মর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ, যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে, তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবেক।

''পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপলক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা জানাইবার নিমিত্ত আমাদিগের শাস্ত্রের সারমর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক।

''বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

''বৈষয়িক সম্বাদপত্রে পরমার্থ ঘটিত রচনা প্রকাশের প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাদিগের অভিলষিত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন। অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ হইয়া তাঁহাদিগের সেই খিন্নতা এইক্ষণে নিবৃত্ত হইল এবং সর্ব্বসাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞান আলোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল।

''এই অমূল্য পত্রিকা তাঁহার চিরজীবন একবৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রতিমাসের প্রথম দিবসে উদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের এবং তাঁহাদিগের বন্ধুদিগের মনোরঞ্জন করিবেক। যদি তাহাদিগের স্নেহের দ্বারা এই পত্রিকার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় তবে তৎকালে ইহার সমাচার দেওয়া যাইবেক''।[১৮]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের সমসাময়িক কালে আরও অনেকগুলি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেইসব পত্রিকার কোনোটাতেই আধ্যাত্মিক বা ধর্মসাধনা সম্পর্কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রকাশ পেত না। অধিকাংশ পত্রিকাই বৈষয়িক বিষয়ে ভরা। তবে ধর্ম-উপধর্ম নিয়ে দলাদলি বেশ ভালো রকমই থাকতো, কিন্তু উপলব্ধিমূলক অধ্যাত্মচেতনার প্রসঙ্গ প্রকাশ পেত না। গোঁড়া হিন্দুরাও ধর্মকে প্রয়োজনের দিক থেকে দেখতেন বলে ধর্ম যে সাধ্যসাধনার বস্তু সে সম্বন্ধে তাঁরা প্রায় অবহিত ছিলেন না বলেই মনে হয়। রামমোহন রায় বৈষয়িক ব্যাপারে অভিজ্ঞ হয়েও অধ্যাত্মচেতনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন যে, পরম করুণাময় ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের পিতাপুত্রের সম্পর্ক। তিনি ছিলেন ব্রহ্মোপাসক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বেদ অপৌরুষেয় নয়। এই বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মতবিরোধ দেখা যায়। তবু বিজ্ঞান মনস্ক ও কঠোর যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার দত্তকেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। অক্ষয়কুমার অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বারো বছর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন।

''১৭৬৫ হইতে ১৭৭৭ শকাব্দ দ্বাদশ বৎসর কাল একাদিক্রমে ইনি সাতিশয় নৈপুণ্য সহকারে পত্রিকার সম্পাদন কার্য্য নিস্পাদন করিয়া উহাকে কতদূর শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ও পরম পদার্থ করিয়া তুলিয়াছিলেন ও তদ্দ্বারা বঙ্গদেশের, এমন কি ভারতবর্ষের কীদৃশ শুভসাধন হইয়াছে, সেকথা সাধারণের স্মৃতিপথ হইতে কখনও

তিরোহিত হইবার নয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ প্রগাঢ় রচনাবিশিষ্ট পত্রিকা বিদ্যমান ছিল না।''[১৯]

দীর্ঘকাল ধরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রচার ও প্রসারের কারণ দক্ষ সম্পাদকের সম্পাদনা। সম্পাদনার নৈপুণ্যের গুণে জনমানসে পত্রিকার গ্রহণযোগ্যতা গড়ে উঠেছে। ''বলা বাহুল্য যে সম্পাদকের ক্ষমতার উপরেই যে কোন সম্বাদপত্র বা সাময়িক-পত্রের উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। অক্ষয়বাবুর মত সম্পাদক না পেলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শিক্ষিত সমাজে নিজ শক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারত কিনা সন্দেহ। অক্ষয়বাবুকে নির্ব্বাচিত করে পত্রিকার সম্পাদনে নিযুক্ত করবার জন্য বঙ্গদেশ দেবেন্দ্রনাথের নিকট ঋণী।''[২০]

অক্ষয়কুমার দত্তের পর নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ঘটে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্ররূপে, ধর্ম সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনার জন্যই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন সত্য, তবে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, আলোচনারও বাহক হয়ে উঠেছিল। শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের চিন্তা চেতনাকে নানা খাতে প্রবাহিত করেছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। অর্থনীতি, গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য, জমিদারের অত্যাচার, শিল্প-বাণিজ্য, সমাজ সংস্কার, স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক উদারনীতি এরকম বহুবিধ আধুনিক জীবনের সমস্যার চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায়।

এক কথায় বলা যায় যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছিল আধুনিক বাঙালির যথার্থ আত্মদর্শন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে স্বতন্ত্র গুরুত্ব অর্জন করেছে শুধু বিষয় বৈচিত্র্যের জন্য নয়, রচনার উৎকর্ষের কথাও অস্বীকার করা যায় না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীতে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি মহর্ষিকে শ্রদ্ধা করতেন। ঈশ্বরগুপ্ত প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন

''তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চিন্তা-মনন-সুরুচি সুনীতির মানদন্ড ধারণ করে বাঙালির ভূমিচারী সত্তাকে গগনস্পর্শী করতে চেয়েছিল, তাতে গুপ্তকবিরও পুরোপুরি সমর্থন ছিল।''[২১]

এতদ্ব্যতীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাময়িকপত্র সহ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন --''১৮১৮ থেকে ১৮৪৩ সন পর্যন্ত বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ, সমাচার চন্দ্রিকা, সম্বাদ কৌমুদী, বঙ্গদূত, জ্ঞানান্বেষণ, বিজ্ঞানসেবধি, বেঙ্গল স্পেক্টটর ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা উনিশ শতকের প্রথমার্ধকে নব নব জীবন জিজ্ঞাসায় উত্তাল করে তুলেছিল। এককথায় বাঙালি মানসের বিকাশ ও বিবর্তনে এই কটি সাময়িকপত্রের দান বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য বহন করছে।''[২২]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অবয়বগত পরিচিতি নিতে গেলে দেখা যায় যে সাধারণত সাময়িক পত্রিকা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে যে পরিমাপের হয়ে থাকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আকার তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। পত্রিকাটি প্রস্থে সাড়ে আট ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্যে তের ইঞ্চি অর্থাৎ একটি ফুল স্কেপ কাগজের মত। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার শুরুতে রয়েছে -

একমেবাদ্বিতীয়ং

১ সংখ্যা

১ ভাদ্র ১৭৬৫ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

এখানে প্রস্থ বরাবর যেমন একটি কালো রঙের মোটা দাগ রয়েছে, তেমনি প্রতি পৃষ্ঠার মাঝ বরাবর একটি করে কালো রঙের বিভাজন রেখা রয়েছে। তার ডাইনে ও বাঁয়ে দুই কলমে লেখা। পত্রিকা প্রকাশের কারণ হিসাবে প্রথম পৃষ্ঠার সম্পাদকীয় লেখনীতে কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়েছে। যদিও পত্রিকার কোথাও সম্পাদকের নাম নেই। সম্পাদকীয় এইরূপ -

''...কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।''

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল আট (৮)। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ব্রাহ্মধর্মের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশ করেছেন। তাই পত্রিকার বিষয়বস্তুতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় ও তার পরের পৃষ্ঠাতেই পরপর (২-৩ ও ৩-৪) ''মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ত্তমান শকের গত ৪ঠা বৈশাখ ব্রাহ্মসমাজে ব্যাখ্যাত হয়।'' এই অংশটুকু দেখা যাচ্ছে। তারপর তৃতীয় পৃষ্ঠায় আবার রয়েছে ''মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ত্তমান শকের গত ১ জ্যৈষ্ঠে ব্রাহ্মসমাজে ব্যাখ্যাত হয়।'' চতুর্থ পৃষ্ঠায় (৪-৬) রয়েছে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' সম্পর্কিত আলোচনা। সপ্তম পৃষ্ঠায় রয়েছে ''মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের চুর্নক।'' এই ব্যাখ্যা রয়েছে পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠা (৭-৮) পর্যন্ত। আলোচনার শেষে ছোট একটি সংবাদ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা সমাপ্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের যখন জন্ম হয় (১৭৮৩ শকাব্দ বা ১৮৬১ সালে) তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আঠারো বছরে পদার্পণ করে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছে। যখন যেমন লেখা সংগৃহীত হয়েছে তার উপর নির্ভর করে পত্রিকায় পৃষ্ঠা সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটেছে। যেমন ১৭৮৩ শকাব্দ (১৮৬১ সাল) বৈশাখ মাসে দেখা যাচ্ছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠার সংখ্যা ছিল ৬। তারপর ১৭৮৩ শকাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় পত্রিকার পৃষ্ঠা বৃদ্ধি পেয়ে ৮ হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধি পেলেও বিষয়ের দিক থেকে বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে না। এই পর্যন্ত পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় কোনো সূচিপত্র অন্তর্ভুক্ত হয়নি। প্রতিটি রচনার পূর্বে বা পরেও রচয়িতার নামের উল্লেখ নেই। পত্রিকার শেষে সারা বছরের মাস মাফিক নির্ঘন্ট সূচি রয়েছে। এই নির্ঘন্ট সূচির পরের পৃষ্ঠায় রয়েছে বর্ণনানুক্রমিক সূচি।

এই সূচিপত্রে বিষয়ের উল্লেখ আছে কিন্তু কে বা কারা সেগুলি লিখেছেন তাঁদের কোনো নামের উল্লেখ নেই।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যেহেতু ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র সেজন্য সমাজের অনুষ্ঠানে সভ্যদের কাছ থেকে কত দান প্রাপ্তি হয়েছে এবং কোন্ কোন্ খাতে কিভাবে তা ব্যয় করা হয়েছে তার একটা হিসাব দেওয়ার তাগিদ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের থেকেই যায় অথবা বলা যায় এটি সম্পাদকের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। আর কোনো সাময়িকপত্র যেহেতু এভাবে কোনো বিশেষ সমাজের মুখপত্র নয় তাই স্বভাবতই সেখানে হিসাব দেবার ব্যাপারটা ওঠে না।

যাই হোক, ফিরে আসি বিষয়গত ব্যাপারে। ১৭৬৫ শকাব্দ ভাদ্র (১৮৪৩ সাল আগষ্ট মাস) সংখ্যা থেকে ১৭৮৩ শকাব্দ বৈশাখ পর্যন্ত পত্রিকার মধ্যে বাহ্যরূপের যে পরিবর্তন দেখি তাতে 'ভাগ' এবং 'কল্প' যুক্ত হয়েছে। বিষয়ের উল্লেখ করলে দেখতে পাব - 'প্রাতঃকালের প্রার্থনা,' 'সম্পদে প্রার্থনা', 'বিপদে প্রার্থনা', 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' এছাড়া রয়েছে ''The famine in the North West Christanity in Danger'' [From the special correspondent of the Englishman] এইভাবে ধর্মীয় বিষয়ভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে ১৭৮৩ শকাব্দ বৈশাখ (১৮৬১ সাল) সংখ্যা শেষ হয়েছে।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে বাংলা গদ্যের বিকাশে সাময়িক পত্রিকাগুলির অবদান অনস্বীকার্য। সাময়িক পত্র-পত্রিকাকে ভর করেই বাংলা গদ্য সাহিত্য জগতে ও সমাজ মানসে দ্রুত আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিল। সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাতেই আলোচনা সমালোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্য মধ্যযুগীয় জড়তা থেকে মুক্ত হয়েছে এবং ভাষায় গতিবেগ এসেছে। অধিকাংশ সংবাদপত্রের ভাষা হালকা ও সহজ, কেবল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ভাষার লঘুতা বর্জন করা হয়েছে। কারণ তত্ত্ববোধিনী ধর্মীয় পত্রিকা - কোনো কারণেই স্থূল রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। তবে সংবাদ ও রচনা বৈচিত্র্যের জন্যই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং স্বমহিমায় দীর্ঘজীবী হয়েছিল।

**উল্লেখপঞ্জি ঃ**


১। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, সুকুমার সেন, পৃ-৩৯।

২। বাংলা সাময়িকপত্র, ১ম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ-৪১।

৩। The Friend of India (February, 1842) পৃ-১১৬।

৪। বাংলা সাময়িকপত্র, ১ম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ-১০।

৫। তদেব, পৃ-১৫।

৬। তদেব, পৃ-১৬।

৭। তদেব, পৃ-১৭।

৮। তদেব, পৃ-৩০।

৯। তদেব, পৃ-৩২।

১০। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, বিনয় ঘোষ, পৃ-১৮।

১১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৩৭ শকাব্দ, পৃ-৮২-৮৩।

১২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮৩৭ শকাব্দ, পৃ-১০৩।

১৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৩৭ শকাব্দ, পৃ-৮১।

১৪। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃ-৬৮-৬৯।

১৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৩৭ শকাব্দ, পৃ-৮৩।

১৬। তদেব, পৃ-৮৪

১৭। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃ-৩৫৮-৩৫৯।

১৮। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৩৭ শকাব্দ, পৃ-৮৩-৮৪।

১৯। তদেব, পৃ-৮৭।

২০। তদেব, পৃ-৮৬।

২১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ-৩৯৬।

২২। তদেব, পৃ-৩৯৬।